ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আশীষ লাহিড়ী

ভারতে বিজ্ঞানচর্চা বিকাশ লাভ করেছিল বিভিন্ন দর্শনের মতাদর্শগত সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। এই সরল সত্যটাকে ধামাচাপা দিয়ে একদল লোক চিরকালই প্রচার করে আসছেন, ভারতে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল সরল, দ্বন্দ্বহীন একরৈখিক পথে, আর সেই গড়ে ওঠার পথে তার সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শন, যা কিনা সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় দর্শন বলে প্রচারিত। ইদানীং আবার এই বক্তব্যটাকে খুব খোলাখুলি ছালচামড়া-ছাড়ানো হিন্দুত্ববাদী রূপ দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন বর্তমান ভারত সরকারের পোষা কিছু মানুষ। যাঁরা এই অনৈতিহাসিক বক্তব্যর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভারতে সংশয়বাদী, অনীশ্বরবাদী কিংবা অনাধ্যাত্মিক দর্শনের অভাব কোনোদিন ছিল না। অমর্ত্য সেনের মতে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় এসবের চর্চা ভারতে কিছু বেশি পরিমাণেই হয়েছিল। অদ্বৈতবাদেরই মতো, আদি নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য, বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন, ন্যায়-বৈশেষিক কিংবা চার্বাকও তো আগাপাশতলা ভারতীয় দর্শন। মদশক্তিরহিত সাধারণ কয়েকটি উপাদানের মধ্য থেকে মদশক্তির উদ্ভবের উদাহরণ দিয়ে চার্বাক দর্শন যেভাবে জড়পদার্থ থেকে প্রাণশক্তির উদ্ভবের সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিল, তা আজকের দিনেও চমৎকৃত করে। অথচ তখন সুরাকরণ বা ফার্মেন্টেশন সম্বন্ধে ভৌত অর্থে কিছুই জানা ছিল না। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই চার্বাক দর্শনকে সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে চার্বাক-চর্চার কাজ সুগম করে দিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮৫৩-১৮৫৮ সালের মধ্যে 'বইটি নিজের উদ্যোগে সম্পাদনা করেন বিদ্যাসাগর। তার থেকেই লোকে – এদেশে ও বিদেশে – প্রাচীন ভারতের আপসহীন নিরীশ্বরবাদী বেদবিরোধী এই [চার্বাক] দর্শনের কথা জানতে পারেন। ... সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে (১৮৫১-১৮৫৮), নানা কাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই দামি কাজটিও করেছিলেন।' শুধু তাই নয়, 'কালীমতীদেবী ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-র প্রথম বিধবা বিবাহ' আয়োজনের সমস্ত 'ঝামেলার মধ্যেই' তিনি সে-কাজটি সম্পন্ন করেন।[২] 'এই বইটি দিয়েই আধুনিক বিশ্বে চার্বাকচর্চার সূত্রপাত। এতেই প্রথম বেশ কয়েকটি চার্বাকসূত্রর উল্লেখ আছে (যদিও অবিকল উদ্ধৃতি নয়)।[৩] ভারতের বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যে-মতাদর্শগত সংঘাত চলেছিল, এবং সে-সংঘাত ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার গভীর মূল্যায়ন করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের (যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮৩) উপক্রমণিকায়। ভারতের বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে সংঘাত কীভাবে বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অতি অসাধারণ আলোচনা রয়েছে। অথচ একদল লোকের মতে ভারতে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল সরল, দ্বন্দ্বহীন একরৈখিক পথে, আর সেই গড়ে ওঠার পথে তার সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শন, যা কিনা সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় দর্শন বলে প্রচারিত।

একটা সময় ছিল যখন দর্শন আর বিজ্ঞান আলাদা ছিল না। ইউরোপে সতেরো শতকে বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটার পর থেকে বিজ্ঞান ক্রমে একটা স্বয়ংস্বতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার নিজস্ব, অর্থাৎ দর্শনের থেকে স্বতন্ত্র, এক পদ্ধতিতন্ত্র ও যুক্তিধারা ক্রমে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করতে থাকে। কিন্তু ভারতে সেই বিজ্ঞান-বিপ্লব না-ঘটায় দর্শন-বিজ্ঞান বিচ্ছেদের এই অভিঘাতের তাৎপর্য ঔপনিবেশিক ভারতের মনীষীদের, এমনকি অনেক বিজ্ঞানীর, মননকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। তাই নিখাদ বিজ্ঞানের আলোচনাতেও তাঁরা অধিবিদ্যক প্রসঙ্গ টেনে আনতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তা তাঁদের জাতীয়তাবাদী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী আবেগকে তৃপ্ত করত। বলা যেতে পারে, সেটাই ছিল জাতীয়তাবাদী মননের মূলস্রোত।

যাঁরা এর প্রধান ব্যতিক্রম, অর্থাৎ যাঁরা জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিচ্ছেদের ঐ তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বঙ্গদেশে যে-চিন্তাধারাটিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সাক্ষাৎ উত্তরসূরি বলা চলে, তার প্রতিনিধি প্রফুল্লচন্দ্র।

প্রফুল্লচন্দ্র: পাল্টা প্রকল্প

প্রফুল্লচন্দ্রের *A History of Hindu Chemistry* (প্রথম খণ্ড ১৯০২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৯) একটি চিরায়ত গ্রন্থ। বইটি লিখে আচার্য রায় একটি জাতীয়তাবাদী কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সেই জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য তিনি গোপন করেননি: 'হিন্দুজাতির এক গৌরবময় অতীত ছিল, এবং এক সুপ্ত কিন্তু বিশাল সম্ভাবনা আছে; সে আরো গৌরবময় এক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম। বিশ্বসভায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমার দেশবাসী যদি তাদের হৃত স্থান পুনরুদ্ধারের কাজে এই বই থেকে প্রেরণা পায়, তাহলে জানব আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।' 'ভারতীয়' অর্থে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহারের যে-দুঃখজনক রেওয়াজ তখনকার দিনে চালু হয়েছিল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ধারেকাছেও যায়নি। অথচ যে-সময় তিনি বইটি লিখছেন, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক, তখন কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই স্রোতের ভগীরথ, বলাই বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে বিখ্যাত ফরাসি জৈব রসায়নবিদ পিয়ের বের্তেলো (Pierre Eugene Marcellin Berthellot, 1827-1907) রচিত গ্রীক আলকেমির ইতিহাস (*L'Alchemistes Grecs*) পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। বের্তেলোকে জানান, প্রাচীন ভারতেও আলকেমির চর্চা অনেক দূর এগিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে বের্তেলো এ বিষয়ে বিশদ জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। প্রবীণ প্রসিদ্ধ রসায়নবিদের এই আন্তরিক সাড়া প্রফুল্লচন্দ্রকে উৎসাহিত করে। 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকা অংশের ভিত্তিতে একটি লেখা তিনি বের্তেলোকে পাঠান। সেটিকে উপজীব্য করে বের্তেলো *Journal des Savants* পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের কয়েকটি মুদ্রিত কপি, এবং সীরিয়, আরবি ও মধ্যযুগের আলকেমি সম্পর্কে তাঁর সুবিশাল রচনাসংগ্রহ উপহার দেন এই অনুজ বাঙালি রসায়নবিদকে। প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখনো চল্লিশ পেরোয়নি।

বের্তেলোর বইগুলি পড়ে তাঁর মনে হল, ঐ ধাঁচে প্রাচীন ভারতের আলকেমি-চর্চার একটি ইতিহাস লিখবেন তিনি। শুরু হয়ে গেল কাজ। মূল গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য দেশ-বিদেশের বহু লাইব্রেরিতে সন্ধান চলল। পণ্ডিত হরিশচন্দ্র কবিরত্ন ও নবকান্ত কবিভূষণ এ কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেন এ বই লেখার কাজে। বছর চারেকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯০২ সালে বেরোল *A History of Hindu Chemistry*-র প্রথম খণ্ড। একজন বিশেষজ্ঞ ও সক্রিয় বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে পুরোদস্তুর গবেষণা করে আস্ত একখানা প্রামাণিক বই লিখছেন, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে খুব বেশি ঘটেনি। বের্তেলোকে বাদ দিলে, এর সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন, বলাই বাহুল্য, জে ডি বার্নাল। জোসেফ নীড্‌হ্যামকেও এই গোত্রে ফেলা যায়, যদিও জীবনের দ্বিতীয় অর্ধে তিনি আর সক্রিয় বিজ্ঞানচর্চা করতেন না। *Journal des Savants*-এর জানুয়ারি ১৯০৩ সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের বইয়ের তেরো পৃষ্ঠাব্যাপী এক সমালোচনার শেষে বের্তেলো লেখেন: 'বিজ্ঞান ও মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক মননগত লেনদেনের যে-সম্পর্ক চলে আসছে, তারই স্বীকৃতি স্বরূপ এই নতুন অধ্যায়টি সবিশেষ উপযোগী।'

এর তাৎপর্য, বিজ্ঞানের ইউরোপ-কেন্দ্রিক উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-ধারণা তখন বিদ্বৎমহলে প্রচলিত ছিল, তা বদলানোর মতো মালমশলা পেশ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ইতালির *Archivio di storia della Scienzia* এই বইয়ের সমালোচনা করে যে-কথা বলল তা আরো তাৎপর্যপূর্ণ: 'সবদেশেই একদল লোক থাকে, নির্বোধ সংকীর্ণ

স্বাজাত্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে যারা বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞান কেবল তাদেরই দেশে বিকশিত হয়েছে, এবং সেটা তাদেরই সম্পত্তি। কিন্তু আরেকদল মানুষ আছেন যাঁদের রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষাগত প্রস্তুতি, রয়েছে তথ্য সংগ্রহ করার, বিচার করার ও তা নিয়ে লেখবার মতো মনীষা। এঁরা যখন নিজ দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত মমত্ব ও স্বাভাবিক দক্ষতা নিয়ে কোনো কাজে নিয়োজিত হন, তখন তাঁদের মধ্যে কাজ করে একটা উদার দর্শন, একটা সংস্কারমুক্ত মন। সুতরাং এঁদের রচনা আমরা গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে বাধ্য। ভারতে রসায়নের ক্ষেত্রে সার পি সি রায়ের স্থান ঠিক এরকমই। তাঁর কাছে আমরা অনেক কাজের জন্যই ঋণী। ... কিন্তু যে মহান কীর্তির জন্য তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে সেটি হল তাঁর রচিত আদিকাল থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ভারতীয় রসায়নচর্চার এই অতুলনীয় ইতিহাসটি।' আরেক জগদ্বিখ্যাত রসায়নবিদ অ্যারেনিয়াস (Svante August Arrhenius, 1859-1927) আচার্য রায়ের বইয়ের কিছু কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করে দেখালেন, ধাতুঘটিত, বিশেষ করে পারদঘটিত ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে (যথা মকরধ্বজ) ভারতই বিশ্বে অগ্রণী। *Nature, Knowledge, American Chemical Journal* প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাতেও এ বইয়ের সপ্রশংস সমালোচনা বেরোল। বিভিন্ন ভাষায় এর কিছু কিছু অংশ অনূদিত হল।

A History of Hindu Chemistry -র দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয় ১৯০৯ সালে। তার আগেই ১৯০৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের গুরুপ্রতিম বের্তেলো মারা গেছেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে দ্বিতীয় খণ্ডটি উৎসর্গিত হয়। *Journal Asiatique*- এ এটির সমালোচনা লেখেন সিলভ্যাঁ লেভি। তিনি রায়ের বহুভাষিক দক্ষতায় চমৎকৃত হন।

এ প্রসঙ্গে আচার্য রায়ের ছাত্র মেঘনাদ সাহার স্মৃতিচারণটি উল্লেখযোগ্য –

> সার পি সি রায় আমাদের বলতেন যে, অধ্যাপক বার্থিলোর অনুরোধে তিনি ''হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস'' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে তাঁকে প্রায় আট-নয় বছর টানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। একজন পণ্ডিতকে (হরিশচন্দ্র কবিরত্ন) দিয়ে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মানে করাতেন, তার পর প্রাচীন প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক প্রণালী মিলিয়ে দেখতেন। ন বছর ধরে এই অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। (৬০)

মেঘনাদ সাহা একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের তীব্র জাতীয়তাবাদী আবেগের প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সেই জাতীয়তাবাদের বিশেষ ধরনটিকেও চিনে নেওয়া যায়। লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার তিনি প্রাচীন ভারতের রসায়নচর্চার ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ভারতে সদ্য-আগত এক তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক। –

> সার পি সি রায় প্রাচীন হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই যুগের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করছিলেন। কতকগুলি মাটির ভাণ্ডের ছবি, যাহার নীচে জ্বাল দিয়া ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা (sublimation) মকরধ্বজ ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। ইংরেজ যুবকটি তাচ্ছিল্যভরে নাক সিঁটকাচ্ছিলেন এবং হাসি সম্বরণ করতে পারছিলেন না। আচার্যদেব তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যন্ত্রপাতির ব্যাখ্যা শেষ করে হাতে এক ডেলা মকরধ্বজ নিলেন। মকরধ্বজ হল রিসাব্লাইম্ড মার্কিউরিক সালফাইড। কবিরাজরা এখনও সেই প্রাচীন নিয়মেই মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন। ... মকরধ্বজের ডেলা হাতে নিয়ে তিনি বললেন – ''বন্ধুগণ, আজ হতে দু হাজার বছর পূর্বে সেকেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতবাসীরা এই অপূর্ব ঔষধ প্রস্তুত করে মানবজাতির কল্যাণার্থ ব্যবহার করেছেন, রোগে শান্তি দিয়েছেন –এখনকার উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এর চেয়ে বিশুদ্ধ Resublimed mercuric sulphide তৈয়ারী হয়নি। হিন্দুরা সামান্য মাটির ভাণ্ডে এরূপ বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিয়াছিলেন কোন্ সময়ে – প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে, যখন আমার ঐ বন্ধুটির (ইংরাজ যুবকটিকে দেখিয়ে) পূর্বপুরুষেরা পশুচর্মে লজ্জা নিবারণ করিতেন এবং বন্য ফল খেয়ে জীবনধারণ

করতেন।" এই কথা বলা মাত্র ভারতীয় শ্রোতারা করতালি দিয়ে উঠল। তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক যুবকটি লজ্জায় লাল হয়ে সবেগে ঘর থেকে ছুটে পালালেন। পরে তিনিই সার পি, সি, রায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। ৫৮-৫৯

কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের আসল কৃতিত্ব এই যে উচ্ছ্বাসের ফেনা সরিয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় তিনি বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। দূরকল্পনা কিংবা অপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক বর্ণনার বদলে অকাট্য পাথুরে প্রমাণ সহযোগে কিংবা স্বহস্তে চালানো পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক কৃতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল পেশ করলেন। তিনি দেখালেন,

> প্রাচীন ভারতে প্রয়োজনীয় কৌশলশিক্ষা (the useful Arts) এবং বিবিধ বিজ্ঞানের চর্চা (যা নিছক হস্তশিল্প থেকে আলাদা) করতেন উচ্চশ্রেণীভুক্ত লোকেরা। ... দুঃখের কথা, অত্যন্ত কট্টর রূপে জাতিভেদপ্রথা যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এসবের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল।[ছ]

জাতিভেদপ্রথার মূল ভিত্তি হল বংশানুক্রমিক পেশা। রায় বলছেন:

> বৈদিক যুগে ঋষি বা পুরোহিতরা একটা স্বয়ংস্বতন্ত্র বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন না। সুযোগসুবিধা ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী তাঁরা বিভিন্ন পেশা বেছে নিতেন। ... কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতন অথবা বহিষ্কারের পর ব্রাহ্মণরা যখন নতুন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন তখন এ সবই বদলে গেল।[জ]

ভারতের অতি-উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন:

> সুশ্রুতের মতে শল্যচিকিৎসার ছাত্রের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ ছাড়া জ্ঞান লাভ অসম্ভব। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ মারফত সংগৃহীত জ্ঞানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এই মহাবিশারদ । কিন্তু মনুর কাছে এসবের কোনো মূল্য ছিল না। ... তাই আমরা দেখতে পাই, বাগ্‌ভটের সময়ের কিছুকাল পর থেকেই শল্যছুরিকার ব্যবহারকে নিরুৎসাহ করা হয়। অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (অ্যানাটমি) আর শল্যচিকিৎসার চর্চা ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। কার্যত হিন্দুদের কাছে এসব বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল।[ঝ]

জাতিভেদপ্রথার প্রকোপ বিজ্ঞানচর্চার এই বিলুপ্তির একটা কারণ। অন্য কারণটি দার্শনিক বা মতাদর্শগত। সেই দার্শনিক আক্রমণের হোতা শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধবৈরি শঙ্করাচার্যের উত্থানের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানের অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে তিনি মনে করেন–

> শঙ্কর কর্তৃক পরিশীলিত ও সম্প্রসারিত বেদান্তদর্শন, যা এই কথা শেখায় যে এই বস্তুজগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাও ভৌত বিজ্ঞানের চর্চাকে হীন প্রতিপন্ন করে তোলার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

এর বিপরীতে প্রফুল্লচন্দ্র স্থাপন করেন কণাদের পরমাণুতত্ত্ব এবং বৈশেষিক দর্শনকে। ঐ দর্শনকে শঙ্কর যেভাবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি:

> কণাদ ও তাঁর দর্শনতন্ত্রের নিন্দায় শঙ্কর খড়্গহস্ত। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য থেকে দু একটি অংশ তুলে দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। [শঙ্কর বলছেন], 'অতএব ইহা প্রতীয়মান হয় যে পরমাণু-মতের সপক্ষে যেসকল যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তাহা নিতান্তই দুর্বল; শাস্ত্রের যেসকল অনুচ্ছেদে ব্রহ্মকেই আদিকারণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, ঐ মত তাহার বিরোধী। মনু প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাগণের কেহই ঐ মতকে সমর্থন করেন না। অতএব যেসকল উচ্চমনা ব্যক্তি আপন আত্মিক মঙ্গলকে মূল্য দেন তাঁহাদের সকলেরই উচিত ঐ মতকে অগ্রাহ্য করা।' [ঞ]

শঙ্করের মতে বৈশেষিক দর্শন 'অর্ধ-সর্বনাশী অথবা অর্ধ-ধ্বংসাত্মক।' অথচ প্রফুল্লচন্দ্র জানাচ্ছেন, কণাদের 'শব্দ-পরিবহণ তত্ত্ব আজ এতদিন পরেও আমাদের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। আলোক ও তাপ যে একই মৌলিক বস্তুসত্তার রকমফের মাত্র, এই মর্মে তাঁর বিবৃতিও কিছু কম চমকপ্রদ নয়।' কণাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে যে-ছয়টি বর্গে বিন্যস্ত করেন (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায়) তার বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছন্নতা প্রফুল্লচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। বৈশেষিক দর্শন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে তিনি দেখাতে চান, প্রাচীন, অর্থাৎ শঙ্কর-পূর্ববর্তী ভারতবর্ষ বিজ্ঞানচর্চায় এবং বিজ্ঞানভাবনায়, তত্ত্বে ও প্রয়োগে, অতীব উন্নত ছিল। অথচ সেই বৈশেষিককে এবং পরমাণুবাদকে, এক কথায় ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার বিশ্লেষণী ধারাটিকে, অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছিলেন অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য। সে-আক্রমণে শঙ্করই জিতেছিলেন। প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক পতনের এটাই প্রধান দার্শনিক কারণ।

তিনি দেখালেন, গুপ্ত-পরবর্তী যুগ থেকে ভারতের সংস্কৃতির একটা ক্রমিক দ্বিখণ্ডন ঘটতে থাকে। ক্রমে সংকীর্ণ হতে থাকে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের স্থান। তুর্কি আক্রমণ সেই দ্বিখণ্ডনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ততদিনে আরবি বিজ্ঞানচর্চার বেগবতী ধারাও স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে একদিকে সক্রিয় আরবি বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ভারতীয়দের তেমন কোনো যোগ গড়ে উঠল না, অন্যদিকে ভারতের নিজস্ব বিজ্ঞানচর্চার ধারাও হয়ে এল শীর্ণ। কয়েক শতকের মধ্যে সুশৃঙ্খল পরীক্ষাভিত্তিক আরোহী বিজ্ঞানচর্চা ভারত থেকে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে গেল। 'সমাজের মননশীল অংশের সঙ্গে করণকৌশলের চর্চাকারী অংশের কোনো যোগ রহিল না; কাজেই বিবিধ ব্যাপার কেমন করিয়া এবং কেন ঘটে, কার্য এবং কারণের সমন্বয় কী করিয়া সাধন করা যায় সেসকলের বোধ, এককথায় অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি, ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। ... ভারতবর্ষ তখনকার মতো পরীক্ষানির্ভর ও বিশেষ ঘটনা হইতে সামান্য সিদ্ধান্তমূলক আরোহী (inductive) বিজ্ঞানকে বিদায় দিল। ভারতের মাটি একজন বয়েল, একজন দেকার্ত বা একজন নিউটনের জন্ম দেওয়ার পক্ষে মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া উঠিল, এদেশের নাম বিশ্বের বিজ্ঞান-মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল।'[হঙ]

আধ্যাত্মিকতা ও অধিবিদ্যাই ভারতীয় সভ্যতার মূলাধার, এই ধারণা খণ্ডন করার কাজটা প্রথম করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)। অক্ষয়কুমারের সেই বক্তব্যকে আরো গবেষণাসমৃদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ, সংগঠিত ও বিস্তারিত রূপ দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ১৯১৮ সালে তিনি বলেন,

> সচরাচর ইহাই স্বীকৃত যে হিন্দুরা ছিল এক স্বপ্নচারী, অধ্যাত্ম-রহস্য-মগ্ন জাতি, অধিবিদ্যক দূরকল্পনা ও আধ্যাত্মিক ধ্যানই তাহাদের কাজ। অতীব জটিল সাংখ্য-দর্শন ও গীতা সমেত উপনিষদ, ষড়দর্শন প্রভৃতি অমূল্য সম্পদের স্রষ্টারূপে হিন্দুরা ন্যায্য মর্যাদারই অধিকারী। কিন্তু পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রেও যে তাহাদের মস্ত অবদান রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে বর্তমানে প্রায় কেহই জ্ঞাত নহে। [হচ]

আপন বক্তব্যের সপক্ষে ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা রামচন্দ্রের 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' বই থেকে উদ্ধৃতি দেন তিনি: 'পরীক্ষার দ্বারা যাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই, এমন সকল কিছু আমি বর্জন করিয়াছি। ... প্রকৃত শিক্ষক তাঁহারাই যাঁহারা শিক্ষালব্ধ বিষয়কে প্রয়োগ করিতে সক্ষম। অপরাপর শিক্ষক ও শিষ্যরা মঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গেই তুলনীয়।' যশোধরের রচিত 'রসপ্রকাশসুধাকর' বইতে লেখা হয়েছিল: 'এই গ্রন্থে বর্ণিত যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি আমার স্বহস্তে সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া আমি কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি না। আমার নিজস্ব প্রত্যয় ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করিলাম।'[হছঅ]

এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ-সর্বস্ব প্যারাডাইম, অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ-বিরোধী জগৎমুখী প্যারাডাইম, এই দুয়ের উদ্ভব একই সঙ্গে হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র আক্ষরিকভাবেই প্রতিবেশী হিসেবে বছরের পর বছর বাস করলেও এই নিয়ে এঁদের মধ্যে কী ধরনের

তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তার কোনো বিবরণ আমি পাইনি। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন, কৃতজ্ঞ থাকব।

ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাস নিয়ে দুই প্যারাডাইমের এই দ্বন্দ্ব আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে আরো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও বিতর্ক চালানোর সুযোগ রয়েছে।

---

[৮] রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, সদেশ, কলকাতা ২০১০, পৃষ্ঠা ৮-৯

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯

১০ Prafulla Chandra Ray, *A History of Hindu Chemistry*, Vol. I, Chuckerverty, Chatterjee & Co. Ltd, Calcutta; London: Probstham & Co. , (1902) 1904 (2nd Ed), p. 190. বাংলা অনুবাদ আমার।

১১ ibid, p. 192

১২ ibid, p. 193

১৩ ibid, Vol. II, p. 17

১৪ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত, *অন্বেষা*, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৪৭।

১৫ ঐ

১৬ ঐ